ঈশপের গল্প-পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ : তিন অধ্যায় তিন ধারা

মহুয়া ভট্টাচার্য

স্রষ্টার যে কোনো কথা বা আখ্যান উচ্চারিত বা লিখিত হয় অপর কোনো শ্রোতা ও পাঠকের উদ্দেশে। অর্থাৎ আত্ম ও অপরের মধ্যে এক দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক তৈরি হয় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই আদান প্রদানে কেউ সহায়ক হয়, কেউ বা বিরোধী। একটি ছকের আকারে এই পদ্ধতিকে সাজালে স্পষ্ট হয় বক্তব্য :-

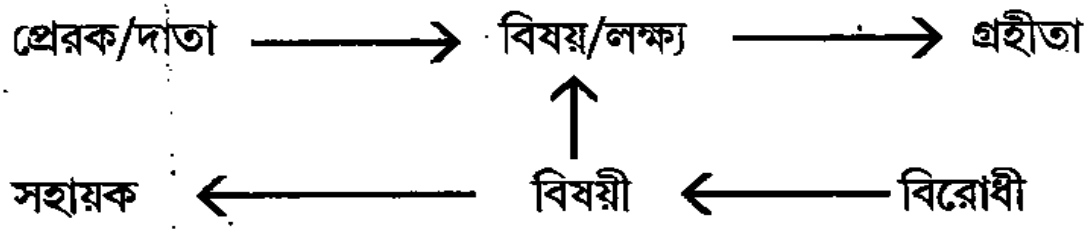

সুপ্রাচীন মৌখিক সাহিত্য থেকে বর্তমানের যে কোনো সৃষ্টিকর্ম — কথন ও আখ্যানের এই সরল অথচ মুখ্য রূপতত্ত্ব নিয়ে শতাব্দী ধরে গবেষণা করেছেন ভাষাতত্ত্বিকরা। গ্রেইমাস কথিত এই Actant Model যে কোনো আখ্যানের Deep Structure-কেই দ্যোতিত করে। উদাহরণ দিয়ে এর বিশেষ উপযোগিতা বোঝানো যায়। যেমন, কোনো লোককথা বা রূপকথার নায়ক (Subject/বিষয়ী), যে সাধারণত মধ্যবিত্ত বা অনভিজাত যুবক, এক সুন্দরী রাজকন্যাকে (Object/ বিষয়/লক্ষ্য) স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চায়। তার এই 'আকাঙ্ক্ষা' (desire/search) পূরণে তার বন্ধু বা আত্মীয়রা তার 'সহায়ক' (helper) হয়। রাজকন্যার পিতা বা বিমাতা বা কোনো দৈত্য বিরোধী (opponent) হবে। এই 'বাধা' দূর হবে কোনো যাদুমন্ত্রে বা দেবতার সঙ্গে যুবকের 'যোগাযোগে' (communication)। যুবকটি ওই অলৌকিক ক্ষমতাধারী ব্যক্তি বা দেবতার (helper/Super helper) সাহায্য পাবে, ফলে কাহিনীর শেষে রাজত্ব ও রাজকন্যা পেয়ে সে হয়ে উঠবে 'গ্রহীতা' (receiver/ beneficiary)। প্রেরক বা দাতা কথক বা লেখক নিজে।

অতএব ছটি Role বা Actant দ্বিমুখী বৈপরীত্যের ভিত্তিতে তিনটি আন্তঃ সম্পর্কিত জোড় তৈরি করে, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর সমস্ত কথন ও আখ্যান, তার অনুবাদ, বিভিন্ন সংরূপ। জোড়টি হল :-

দাতা/গ্রহীতা (giver/receiver) : যোগাযোগ (communication)

বিষয়ী/বিষয় (Subject/object): আকাঙ্ক্ষা, সন্ধান বা লক্ষ্য (Desire search or Aim)

সহায়ক/বিরোধী (helper/opponent) : সহায়তা অথবা বাধা (auxiliary support/hindrance)

এই মূল রূপতাত্ত্বিক ছকটি এক্ষেত্রে উল্লেখের কারণ হল মৌখিক থেকে লিখিত, শতাব্দী ব্যাপী অজস্র সৃষ্টিতে আমরা দেখি একই কাহিনীসূত্রে 'এনকোজি' দ্বারা এক গল্প থেকে অন্য গল্পে, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে, এক সংরূপ থেকে অন্য সংরূপে স্থানান্তরিত হচ্ছে। মূল কাহিনীসূত্রকে এক রেখেও স্বতন্ত্র মাধ্যম ও সংরূপের দ্বারা অসংখ্য কাহিনী তৈরি করে বহুমাত্রিক discourse বা প্রকরণের জন্ম দিচ্ছে। প্রতিটি সংরূপের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার বা motif অভিন্ন হবে, এবং তার 'ডিকোজি'-এর মাধ্যমে আবার অসংখ্য আখ্যান গড়ে উঠবে। ঠিক এই ভাবেই শতাব্দী প্রাচীন কোনো মৌখিক কাহিনী রূপ বদলাতে বদলাতে লিখিত হয়েছে, এবং এখনও পর্যন্ত তার অন্তঃস্থিত কাহিনীসূত্র বা motif ব্যবহৃত হয়ে চলেছে বিচিত্র প্রকরণের মাধ্যমে। যেমন ধরা যাক, মহাভারতের একটি কাহিনীসূত্র (motif) 'ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব'। মুখে মুখে শ্লোকে বলা মূল মহাভারত থেকে কবিতায় লেখা মহাভারত, তার থেকে গদ্যানুবাদ, বঙ্গানুবাদ, নাটক, পুরাণ, উপন্যাস, গল্প, চলচ্চিত্র, কমিক, পটচিত্র, গীত ইত্যাদি অসংখ্য প্রকরণের মাধ্যমে একই কাহিনীসূত্রকে বজায় রেখে আজও নতুন নতুন বাচন, আখ্যান (Discourse) তৈরি হয়ে চলেছে। মিখাইল বাখতিনের ভাষায় — "... a living contact with unfinished, still-evolving contemporary reality (the open-ended present)." [Bakhtin, 1996:47]

বস্তুত সংস্কৃতে গদ্যসাহিত্য বিভক্ত ছিল দুটো মূল ধারায় — একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর ধারা বা 'আখ্যায়িকা', অন্যটি কল্পিত কাহিনী বা 'কথা'। এমনই এক প্রাচীনতম কথাগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। এখানে পশুপাখি ও মানুষের গল্প একই সঙ্গে সংকলিত, বাস্তব ও কল্পনার আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটেছে। এমন কথা সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও প্রচুর। আবার প্রাচীন মিশর, গ্রীস, পারস্যেও কথার ব্যবহার পাওয়া যায়। এবং এগুলো মূলত রাজনীতির জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে, রাজপুত্রদের নীতি শিক্ষার পাঠ দিতে রচিত হয়েছিল। ৬২০-৫৬০ খৃষ্টপূর্বে ঈশপের গল্পের কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের কুলীন সম্প্রদায়দ্বেষী জনসাধারণকে বশে আনার জন্য মেনিনিয়াস এগ্রিপা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে পেটের বিবাদ ও তার পরিণাম শুনিয়েছিলেন। এরপর পাই জাতক কথা, যার সংকলন অন্তত খৃষ্টপূর্ব ৩৭০-এ শেষ হয়। তুলনায় বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর অনেক নবীন।

খৃষ্টীয় ১ম শতকে গুণাঢ্য পৈশাচীভাষায় 'বৃহৎকথা' লেখেন। এতে রাজা

সাতবাহনের গল্প পাওয়া যায়। পুরাণ অনুসারে গুণাঢ্য নিজে মহাদেবের গণ ছিলেন। পার্বতীর শাপে মানুষ হয়ে জন্ম নেন অন্ধ্রের প্রতিষ্ঠান নগরে এবং রাজা সাতবাহনের সভার অন্যতম পণ্ডিত শর্ববর্মনের কাছে বাজিতে হেরে সমাজ ও সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে বিন্ধ্যারণ্যে বাস করেন। সেখানে শিবের আরেক গণের কাছে বৃহৎকথার গল্প শুনে নতুন শেখা আঞ্চলিক ভাষায় সাত লক্ষ পদ লেখেন যার মাত্র সাত ভাগের এক ভাগ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। গুণাঢ্যের রচনার পরবর্তীকালে সমর্থন পাওয়া যায় সুবন্ধু, বাণভট্ট ও দণ্ডীর রচনায়। দণ্ডী একে 'ভূত ভাষা' বলেন যা গদ্য রোমান্সের এক রূপ ও 'কথা' নামে পরিচিত। এর মধ্যে পদ্যের ব্যবহার ছিল। তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের ওঠাপড়া, বৈচিত্র্য, নানা শ্রেণি, পেশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষ, হাস্যরস — সবই এতে আছে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। রাজা ভোজ বৃহৎকথা পাঠটিকেই এক সাহিত্যিক প্রকরণ আখ্যা দিয়েছিলেন। ধনঞ্জয় তাঁর 'দশরূপক'-এ এবং পরে হর্ষ, ভবভূতি ও আরো অনেকে বৃহৎকথার আদল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন ও অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সংস্কৃত ভাষায় **'পঞ্চতন্ত্র'**-র কথা জানা যায়। এতে জাতক, বৃহৎকথা ও বিভিন্ন জনশ্রুতি থেকে নেওয়া গল্প আছে এবং সেগুলো আলাদাভাবে না বলে এক একটা তন্ত্রে এক এক কথাকে অবলম্বন করে তার সঙ্গে বহু কথা সংযোজন করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের রচনা কৌশল মৌলিক। একটা ধারাবাহিক গল্পসূত্র মেনে রচিত পাঁচটি তন্ত্র — 'মিত্র-ভেদ' অর্থাৎ বন্ধু বিচ্ছেদ, 'মিত্র-প্রাপ্তি' অর্থাৎ বন্ধু প্রাপ্তি, 'সন্ধি-বিগ্রহ' অর্থে শান্তি ও যুদ্ধ, 'লব্ধ-নানা' অর্থাৎ অর্জিত সম্পদের ক্ষতি এবং 'অপরীক্ষিত-কারক' অর্থাৎ হঠকারিতা। এই পাঁচটি তন্ত্রের প্রতিটা গল্প গতিশীল, পূর্ণাঙ্গ ও উপভোগ্য ভাষায় রচিত। গদ্যের মাঝে পদ্যের ব্যবহার আকর্ষক ও ইঙ্গিতধর্মী। মানুষের ক্রিয়া-কলাপ, স্বভাব-ব্যবহারের রূপক হিসেবে পশুচরিত্রের ব্যবহার বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এখানে ব্যবহৃত তীব্র গভীর ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি খুব নিপুণ ও শৈল্পিক। অযুত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতির আদর্শ, গুরুগম্ভীর ও লঘুচপল বিদ্রুপাত্মক বক্তব্য, হাস্যরস, হার্দিক উপদেশ, সরস আখ্যান ও অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ পঞ্চতন্ত্রে। 'তন্ত্র' শব্দটি গল্পসংগ্রহ অর্থে প্রযুক্ত। মূল রচনায় সাধারণত পশুপাখি ও মানুষের গল্পের মধ্যে বিস্ময়গত কোনো ভেদ নেই। অবশ্য পরবর্তীকালে এই গল্পগুলো দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' নামে দুই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্র-এর রচনাকাল নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আরো কয়েকটি মত আছে। ইউরোপীয়ান গবেষক হার্টেল পঞ্চতন্ত্রের ওপর বিস্তর গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম/মূল সংস্করণ তৃতীয় শতকে রচিত হলেও উইন্টারনিৎজ মনে করেন এর রচনাকাল ৩০০-৪০০খৃষ্টাব্দ-এর মধ্যে কোনো এক সময়। পরবর্তী

কালে রাজা খসরু অনোশির্ভান (৫৩১-৭৯) কথক বার্জোকে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদের আদেশ দেন পার্সিয়ার সাহিত্যিক ভাষা পহ্লবীতে। এবং তারও পরে পহ্লবী থেকে সিরীয় ভাষায় অনূদিত পঞ্চতন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় ৫৭০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। বিদেশী রাজার উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বারবার অনূদিত হওয়া পঞ্চতন্ত্রের বিপুল জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা বিষয়েও একইরকম দ্বিধা থাকলেও বিষ্ণুশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় যিনি সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির আদেশে এই পাঠ রচনা করেন রাজপুত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য। এর মূল পাঠ যেহেতু লুপ্ত, তাই সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি এর রচনাকার বিষয়েও। তবে যিনিই লিখে থাকুন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সু-রসিক, বিজ্ঞ এবং সমসাময়িক সাহিত্য-প্রকরণ বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তিনি অত্যন্ত সরল গদ্যে সুচিন্তিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তথাপি তাঁর হাস্যরসবোধ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিও অসামান্য। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এই পাঠ দেববন্দনা, গুরুবন্দনা ও তৎকালীন চতুর রাজনীতিজ্ঞ, যথা — মনু, বাচস্পতি, শুক্র, পরাশর, ব্যাস ও চাণক্যের বন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে। তারপরই এসেছে স্বীয়/রচনাকার হিসেবে আত্মপরিচয়—বিষ্ণুশর্মার, যিনি পৃথিবীর সমস্ত অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা করে তার সারবত্তা দিয়ে গেঁথেছেন পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি পরিসর যা একাধারে সুখপাঠ্য অথচ রাজনীতি-সমাজনীতি বিষয়ে গভীর শিক্ষার আকর।

পঞ্চতন্ত্রের মূলগ্রন্থ লুপ্ত, তাই তার নামকরণ নিয়েও যথেষ্ট দ্বিধা আছে। এটির সবচেয়ে পুরনো যে সংশোধিত গ্রন্থ কাশ্মীরী পণ্ডিত-কৃত 'তন্ত্রাখ্যায়িকা', তার অনুসরণে সংশয় জাগে পঞ্চতন্ত্রের আসল নামও 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' ছিল কিনা, কারণ 'তন্ত্র' শব্দটির অর্থ এখানে অস্পষ্ট বা অবর্ণনীয়। এটিও লুপ্ত, অতএব অমীমাংসিত মূল গ্রন্থের নামকরণ বিষয়টিও। গবেষক ম্যাকডোনেলের মতে এর নামকরণ সম্ভবত দুটি শেয়ালের নামানুসারে হয়েছিল, যথা করটক ও দমনক কারণ এদের অনুষঙ্গ পাওয়া যায় সিরীয় অনুবাদের 'কলিলাগউও দমনাগ' এবং আরবীয় অনুবাদের 'কলিলাহ্উও ডিমনাহ্' নামকরণ থেকে। হার্টেল যদিও মনে করেন প্রকৃত নাম 'পঞ্চতন্ত্র'-ই ছিল। অপরদিকে পঞ্চতন্ত্রকে ভিত্তি করে কিছু বৌদ্ধ নীতিকথা ও গল্পের সন্ধানও পাওয়া যায়। তাছাড়াও বিশ্বব্যাপী বহু শতাব্দী ধরে পঞ্চতন্ত্রের যে অসংখ্য অনুবাদ ও রূপান্তর হয়েছে, সংশোধিত গ্রন্থ প্রকাশ্যে এসেছে, তার অনেকগুলি লুপ্ত হলেও পঞ্চতন্ত্র কিন্তু বরাবর এগুলির মাধ্যমেই শতাব্দীর পর শতাব্দী তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে 'পঞ্চতন্ত্র' শিরোনামেই। পঞ্চতন্ত্র তার অসংখ্য সংস্করণ, সংশোধন, অনুবাদের মধ্যে দিয়েই আজও বেঁচে আছে যদিও মূলগ্রন্থ সহ বহু সংস্করণ ও

একাধিক অনুবাদ বহুদিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। তবুও অতি প্রাচীনকাল থেকেই তার যে রূপান্তর সম্বন্ধে আমরা বিশদে জানতে পারি সেগুলো হল :-

১) তন্ত্রাখ্যায়িকা : এটি দুই সংস্করণে রক্ষিত হয়েছিল — ক) পূর্ণভদ্র প্রণীত জৈন সংস্করণ (১১৯৯ খৃঃ), খ) ক্ষুদ্রাকার জৈন সংস্করণ। এতেও মূল গ্রন্থ সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষিত কিনা তা বলা সম্ভব নয়, তবে সর্বাপেক্ষা অধিক মূলানুগ।

২) পহ্লবী ভাষায় অনূদিত (ষষ্ঠ শতাব্দী) : পাঠ ও মূল পাঠ উভয়ই লুপ্ত। পহ্লবী থেকে সিরীয় ও আরবী ভাষায় যে অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া গেছে তার থেকেই মূল পাঠ ও তার প্রথম অনূদিত পাঠ (পহ্লবী) সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।

৩) উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সংস্করণ : গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র রূপান্তর হিসেবে কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'বৃহৎকথামঞ্জরী'-তে (১১ শতক) পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অবিচ্ছিন্ন ও অবিকৃতভাবে উপস্থিত করেছিলেন তবে তার সংক্ষিপ্তকরণ ঘটেছিল। ১২ শতকে সোমদেব 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে অনুরূপ কাহিনী রাখলেও প্রতি তন্ত্রের শেষে একটি করে নির্বুদ্ধির গল্প সংযোজন করেছেন। বুদ্ধস্বামীর 'শ্লোক সংগ্রহ' রচিত হয় ৮ম - ৯ম শতকে একই উদ্দেশ্যে। তবে পঞ্চতন্ত্র যে প্রকরণে, যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল তার সঙ্গে এই সংস্করণগুলির সাদৃশ্য যৎসামান্য এবং এই পাঠগুলির বিষয় সংস্থাপন ও পরিবেশনা লঘু সাহিত্যের অন্তর্গতই বলা যায়। মূল গ্রন্থের মতো বিশিষ্টতা গুরুত্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন ও মূল্য কোনো পাঠেরই নেই।

৪) দক্ষিণ-ভারতীয় সংস্করণ : যদিও এটিও লুপ্ত কিন্তু একে অবলম্বন করে রচিত তিনটি সংস্করণ পাওয়া যায় – ক) দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্র, খ) নেপালী সংস্করণ, গ) সংস্কৃত সংস্করণ হিতোপদেশ। জৈন মুনি মেঘবিজয় ১৬৫০ থেকে ১৬৬০-এর মধ্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন যা আকারে সমস্ত সংস্করণের থেকে বৃহৎ। মূল গ্রন্থের গল্পের সঙ্গে নতুন কিছু গল্পও যুক্ত হয়েছে এতে। হার্টেলের মতে এই গ্রন্থও বালকদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল। প্রাপ্ত দক্ষিণী সংস্করণের সঙ্গে 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'র সাদৃশ্য অনেক, তাই এই গ্রন্থের গুরুত্ব ও অবদান যথেষ্ট। কারণ মূল গ্রন্থ থেকেই যে এই সংস্করণগুলো জাত তা অনুমান করাই যায়। এই বহুল পরিমাণ সংস্করণ পঞ্চতন্ত্রের জনপ্রিয়তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

নেপালী পঞ্চতন্ত্রের নাম 'তন্ত্রাখ্যান'। ১৪৮৪ সালে এর পুঁথি পাওয়া যায়। এই সংস্করণ বহুলাংশে দক্ষিণী সংস্করণের অনুরূপ।

৫) সংস্কৃত সংস্করণ —হিতোপদেশ : একাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় এক সংস্করণ পাওয়া যায় যথার্থ নীতিকথার প্রকরণে, যার রচয়িতা হিসেবে নারায়ণ শর্মা নামক লেখকের উল্লেখ আছে যিনি রাজা ধবলচন্দ্রের উৎসাহে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩৭৮ সালে নেপাল থেকে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় যার থেকে মনে করা যায় লেখক ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্ভবত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের

অধিবাসী ছিলেন। মুখবন্ধে উল্লেখিত, এটি পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনা) রাজার পুত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। এটি যে মূল পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে রচিত তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, বেতাল পঞ্চবিংশতি থেকেও কিছু কিছু অংশ এতে গৃহীত হয়েছে। গদ্যে পদ্যে মেশানো রচনাশৈলীতে মূল গ্রন্থের আদল অনুসরণ করা হয়েছে। তবে পাঁচটি তন্ত্রের বদলে এতে চারটি তন্ত্র উপস্থিত —মিত্রলাভ, সুহৃদভেদা, সন্ধি, বিগ্রহ। মোট ৪৩টি গল্প আছে। চতুর্থ তন্ত্রের গল্পগুলো এই সংস্করণের বিভিন্ন তন্ত্রে ছড়িয়ে থাকলেও মূল গ্রন্থের চতুর্থ তন্ত্র আক্ষরিকভাবে এই সংকলনে অনুপস্থিত। এটি মূল গ্রন্থের এক সরল ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। গল্পে সৃষ্ট যে কল্পজগৎ তাতে শিশুমনের পরিতৃপ্তি। স্থান ও ব্যক্তির নামকরণে চমৎকারিত্ব অভিনব। এতে শ্লোকের প্রয়োগ বেশি, তবে তা অবশ্যই সুরচিত ও উৎকৃষ্ট ভাবপূর্ণ। পঞ্চতন্ত্র ছাড়াও জাতকের কিছু কথাও এতে স্থান পেয়েছে। এর শিরোনাম-ই হিত-উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যকে সফল ও স্পষ্ট করে। সহজ গল্পের মাধ্যমে উপদেশাত্মক বক্তব্য প্রকাশ, চাতুর্য ও রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান এই সংকলনের লক্ষ্য যা মূল গ্রন্থের অনুরূপ। কিছু কবিতা লেখক নারায়ণ শর্মার স্বকৃত, হয়তো মূলানুবাদ সম্ভব হয়নি বলে, অথবা পাঠকের কাছে সরলীকৃত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রতিটি নীতিবাক্য আজও সমাজে প্রাসঙ্গিক।

উপরি-উক্ত সমস্ত সংকলনের মধ্যে তন্ত্রাখ্যায়িকা প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা মূলানুগ, যদিও মূল গ্রন্থের প্রকরণ ও উদ্দেশ্য এই সংকলনে হুবহু স্পষ্ট নয়। এগুলো ছাড়াও বাংলা ভাষায় অনূদিত সংকলন একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সে বিষয়ে পরে আসছি। তার আগে মূল গ্রন্থের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যাক। একথা আগেও বলেছি, যদিও এ গ্রন্থ পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত এবং প্রতি তন্ত্রের প্রতিটি গল্পের একটা ভূমিকা বা প্রারম্ভ, মধ্য ও অন্ত্য আছে তবুও প্রতিটি গল্প একে অপরের সঙ্গে যুক্ত এবং ধারাবাহিকতার মাধ্যমে গল্প শোনার/বলার গতি ক্রমশ এক তন্ত্র থেকে অপর তন্ত্রে এগিয়ে চলে উত্তরোত্তর আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে।

গল্প বলার এই ধরনের মধ্যে (ক) এমন একটি নির্দিষ্ট আখ্যানশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রতিটি গল্পের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত; (খ) যা এক গল্পের মধ্যে অন্য গল্পকে বেঁধেরাখে, মিলিয়ে মিশিয়ে দেয়; (গ) গদ্য ও পদ্যকে স্বচ্ছন্দে সংযুক্ত করে এবং ছড়ার আকারে নীতিবাক্যর ব্যবহার ক'রে গল্পের সমাপ্তি ও বোধগম্যতাকে অত্যন্ত উপভোগ্য করে; (ঘ) এক গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ পরবর্তী গল্পের সূচনাব্যঞ্জক বা সূত্রধারক, অর্থাৎ পূর্ববর্তী গল্পের সূত্র থেকেই পরবর্তী গল্পে প্রবেশ করা যায়; (ঙ) ব্যবহৃত নীতিবাক্যগুলো প্রতিটি গল্পের যথাযথ মূল্যায়নে সাহায্য করে এবং তা প্রতি গল্পকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার অন্যতম মাত্রা।

পঞ্চতন্ত্র যে একজন অতি দক্ষ লেখকের হাতে রচিত তার অযুত প্রমাণ এই গ্রন্থে। মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক বৈচিত্র্যগুলোকে পশুপাখির আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার অনন্য নিদর্শন পঞ্চতন্ত্র। এই প্রকরণ অভিনব, ব্যঞ্জনাপূর্বক, গভীর অর্থদ্যোতক ও ব্যঙ্গাত্মক। গল্পের ভেতর গল্প – Chinese box pattern সম্বন্ধে আমাদের যে অমিত কৌতূহল তার নিদর্শন যে কোনও মৌখিক সাহিত্যেই সম্ভবত উপস্থিত। জাতকের গল্প থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথামঞ্জরি, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, আরব্য রজনী, ডেকামেরন, ক্যান্টারবেরি টেলস ইত্যাদি সমস্ত পাঠেই এই প্রকরণ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি গল্প নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়। প্রথম তন্ত্র 'মিত্র-ভেদ' প্রসঙ্গেই বলা যায় —কাহিনী শুরু হয়েছে বর্ধমানক নামক বণিকের বাণিজ্য যাত্রা, পথে বলদ সঞ্জীবকের চোট লাগায় উৎকৃষ্ট তৃণভূমিতে অবস্থান, শারীরিক উন্নতি, উচ্চস্বরে ক্রমাগত ডাক শুনে নিকটবর্তী বনের পশুরাজ পিঙ্গলকের ভয় পাওয়া এবং সেই সুযোগে করটক ও দমনক নামক শেয়ালের রাজার উপকারের ছলে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠা, মন্ত্রিত্বলাভ, শঠতা করে দমনকের ক্রমোন্নতিকে করটকের ভর্ৎসনা, কথা প্রসঙ্গে একের পর এক গল্পের অবতারণা, যেমন — 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' [রাজা সাজার আনন্দে চেরা কাঠে লেজ আটকে বানরের মৃত্যু] → মূল গল্প – পিঙ্গলক ও দমনক সংলাপ - দমনক ও সঞ্জীবকের সংলাপ – দমনকের মধ্যস্থতায় পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের বন্ধুত্ব – তৃণভোজী বন্ধুর সান্নিধ্যে পশুরাজ সিংহ ও অন্যান্যদের শিকার - বন্ধু অভুক্ত থাকার যন্ত্রনা ঘোচাতে দমনকের প্রতিজ্ঞা - পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের মিত্রতায় ভেদ ঘটানো – উপায় হিসেবে করটকের প্রশ্নের উত্তরে দমনকের বলা নতুন গল্প → 'বুদ্ধির জয়' [কাকের ডিম ভাঙায় শেয়ালের বুদ্ধির দ্বারস্থ হয় কাক, সাপকে শাস্তি দিতে]। কাককে উপায় বোঝাতে শেয়াল তাকে শোনায় → 'অতি লোভের ফল' [লোভী বক-মামাকে শায়েস্তা করতে কাঁকড়ার আক্রমণ ও বকের মৃত্যু] → ৩য় মূল গল্প – [উপায় খুঁজে পেয়ে রাজবাড়ির গয়না সাপের গর্তে রেখে কাক পেয়াদা দিয়ে সাপকে মারায়] → ১ম মূল গল্প – দমনক করটককে বোঝায় বুদ্ধিমানরা কোনো কাজকেই ভয় পায় না। বলশালীর থেকে বুদ্ধিমানের ক্ষমতা বেশি। এই প্রসঙ্গেই আসে নতুন গল্প → 'সাবাস খরগোশ' [কুয়োর জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়ে নিষ্ঠুর সিংহের প্রাণ-নাশ] → ১ম মূল গল্প – দমনক সুযোগ খুঁজতে থাকে পিঙ্গলকের বন্ধুত্ব ভাঙানোর – এভাবেই আসে পরপর নতুন গল্প ও ফিরে যায় মূল গল্পে। শেষত দমনকের ধূর্তবুদ্ধিতে সঞ্জীবকের প্রাণনাশ করে একদা বন্ধু পিঙ্গলক ও তার নধর দেহ ভক্ষণ করে সিংহ, শেয়াল, কাক প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী। প্রথম তন্ত্রের এভাবেই সমাপ্তি হয়। দ্বিতীয় তন্ত্র 'মিত্র-প্রাপ্তি'তে আবার হানাহানি, মৃত্যু, শত্রুতার পরিবর্তে কাক, ইঁদুর, হরিণ, কচ্ছপ

প্রভৃতি প্রাণীর অন্তরঙ্গতা, বোঝাপড়া, ধৈর্য, সহাবস্থান, হাস্যরসিকতা, মানবিক আদান-প্রদান উপস্থাপিত হয়েছে। প্রখর বুদ্ধিমত্তাসহ চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য, চরম পরিণতি, বাস্তব সমস্যার সমাধান আমাদের জীবনে চলার পথের সংকট কাটিয়ে ওঠার পথ দেখায়। প্রতি তন্ত্রেই নীতিবাক্য গল্পের ভেতরেই সংলাপের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশপের গল্পের মতো এখানে প্রতি গল্পের সমাপ্তির পর আলাদা করে এক একটি নীতিবাক্য উল্লেখিত নয়। কথাপ্রসঙ্গে একাধিক নীতিবাক্য/প্রবাদ চরিত্রদের মুখেই উচ্চারিত হয় প্রতি গল্পের নানা স্থানে। রাজনীতির পাঠ, ধূর্ততা, মূর্খতার পাশাপাশি কোমলতা, সহানুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি মনুষ্যোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি বাস্তব ও নিখুঁতভাবে দেখানো হয়েছে।আবার গ্রামীণ জীবনের ছবি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য নিরুপায়ের উপায় উদ্ভাবন পারদর্শিতার সঙ্গে উপস্থাপিত। আছে নিখাদ প্রেমের গল্প, নারীর প্রবঞ্চনা দেহজ সম্পর্কের গুরুত্ব, সরল উদাহরণ দিয়ে জীবনের বৃহত্তর পাঠ ও নীতি শিক্ষার উজ্জ্বল আলো। এমনকি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের স্পষ্টত উল্লেখ একে স্বতন্ত্র করেছে।

ঈশপের গল্প :

পঞ্চতন্ত্রের হাজার বছর আগে মৌখিক সাহিত্যের আর এক অনবদ্য সৃষ্টি গ্রীক ক্রীতদাস ও গল্পকথক ঈশপ কথিত গল্পমালা। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, আমোদপ্রিয়তা, চতুর পর্যবেক্ষণ ও গল্পচ্ছলে সমাজ-রাজনীতির বিশ্লেষণ তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তিই শুধু এনে দেয়নি, দিয়েছিল প্রসিদ্ধি, সম্মান ও রাজানুগ্রহ। খৃষ্টপূর্ব ৬২০তে জন্ম ঈশপের। নীতিশিক্ষা ও গল্প ব'লে আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁর রচিত ৭২৫টি গল্প মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত। যদিও তাঁর মৃত্যুর (৫৬৪ খৃঃপূ) ৩০০ বছর পরে সেগুলি সংকলিত হতে শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাতে আসল গল্পের রূপান্তর, সংযোজন, বিয়োজন ঘটেছে। বেশ কিছু গল্প হারিয়ে গেছে, আবার কিছু গল্প পরিবর্তিত আকারে ঈশপের নামেই সংকলিত হয়েছে। সমাজের বৈচিত্র্যকে, মানুষের বহুরূপী স্বভাবকে সযত্নে নীতিকথার আদলে পশুচরিত্রের রূপকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছিলেন তিনি। গল্পশেষে ছিল নীতিবাক্যের ব্যবহার যার বেশির ভাগ সার্বজনীন আবেদনে প্রবাদ বাক্য হয়ে ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময় এবং এখনও যা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মৌখিক থেকে লিখিত হওয়ার যে চিরাচরিত সমস্যা থাকে অর্থাৎ মূলের অনুগত হওয়ার জন্য জনশ্রুতিই একমাত্র ভরসা তা এক্ষেত্রেও হয়েছে। আজও নতুন সংস্করণে নতুন গল্প ঈশপকথিত বলে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর পরবর্তী তো বটেই, এমনকি তাঁর পূর্ববর্তী কোনো উৎস থেকে পাওয়া গল্প বা গ্রীসের বাইরের কোনো দেশের ও সংস্কৃতির গল্পও তাঁর নামাঙ্কিত সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রীক ও ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিগুলোই প্রধান উৎস যথাসম্ভব মূলের কাছাকাছি পৌঁছোনোর। যদিও

কবিতার আকারে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় করা সংস্করণগুলিতে মূলের থেকে আবশ্যিকভাবেই তফাত ঘটে গেছে। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পরে বাইবেল ও ঈশপের গল্পই ছিল প্রথম যেগুলো বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রিত হওয়ার পরই অবশ্য এই সংকলন গ্রন্থ ও তার অনুবাদ, অভিযোজন, রূপান্তরিত সংকলনগুলো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রাথমিকভাবে এই গল্পগ্রন্থ পরিণত বয়স্কদের জন্যই রচিত হয় যা ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ভিত্তিক এবং নৈতিকতার প্রদর্শক। রেনেসাঁস পরবর্তীকাল থেকে এগুলো শিশুদের পাঠ্যবিষয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এর নীতিমূলক ধারণাগুলো স্থাপত্য চিত্রকলা ও অন্যান্য বর্ণনামূলক শিল্পের মাধ্যমে বড়দের কাছে ক্রমশ পরিচিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এমনকি নাটক ও গানের মাধ্যমেও এর সংরূপ বদলায়। ঈশপের গল্পকে আদর্শ মেনে 'fable' বা নীতিকথার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত হতে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর বিবর্তনও আলোচ্য হয়।

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের মতো ঈশপের নীতিকথায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় তা হল :- ক) এগুলো শিক্ষামূলক রচনা, মূলত শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও রচিত, নৈতিকতার পাঠ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। খ) গল্পের প্রেক্ষাপট - রাজতন্ত্র। গ) কুশীলব – মানুষেরই এক একটা 'টাইপ'-চরিত্রের প্রতিনিধি পশু-পাখি। ঘ) এর নীতি বাস্তবিক ও প্রয়োজনীয়। স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো নীতিগল্পকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক চরিত্র যা অনায়াসে ভাষা, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। ঙ)বিষয় ভাবনা ও উদ্দেশ্যের নিরিখে বাস্তবিক হলেও নীতিগল্পকেও একটা স্তরে গিয়ে অবাস্তব বলতেই হয়, কারণ, এখানে পৃথিবীর সব প্রাণী কথা বলে এবং একই ভাষায়। মানুষের সঙ্গে তাদের সহাবস্থান। বাস্তব (মানুষ) ও কল্পনার (পশুপাখি) দুই জগৎ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদান এক বিশেষ মাত্রা এনেছে দুই জগতের মধ্যে যাতায়াতের মাধ্যমে। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ব্যবস্থা প্রায় এক। রাজতন্ত্রের নজির বনের জগতেও দেখা যায়। কৌম বা যৌথ সমাজব্যবস্থায় রাজা একজনই – সিংহ, যে মহান ও উদার। তাকে ঘিরে আরো তিন 'মণ্ডল' পদাধিকারের ক্রম হিসেবে বিন্যস্ত – মন্ত্রী, সভাসদ ও পরিচারক বা ভৃত্য। অথবা এই বৃত্তগুলো রাজসভা, নগর ও দেশ এই আবর্তকেও চিহ্নিত করে। মানুষের সম্প্রদায় ও প্রকৃতির সম্প্রদায় —এর মধ্যে রূপক, উপমার সাহায্যে ক্ষমতার রাজনীতি ও তার পালাবদলের কারণগুলো যেমন —শত্রুতা, হিংসা, লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চপদ, রাজানুগ্রহ, তাঁবেদারি ইত্যাদি প্রবৃত্তির রূপায়ণ করা হয়েছে বিভিন্ন মানবরূপী পশু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। মানবসমাজের দর্পণ এই পশুসমাজের মধ্যে দিয়ে

মানুষ তারই স্বভাব, অনুভূতিগুলো প্রতীকায়িত করেছে, যেমন — সিংহের মতো সাহসী, শেয়ালের মতো ধূর্ত, প্যাঁচার মতো বুদ্ধিমান, সাপের মতো কুচক্রী, ময়ূরের মতো অহঙ্কারী, গাধার মতো পরিশ্রমী ইত্যাদি আরো অজস্র। আবার এই রূপকধর্মিতার অন্তঃস্থলেই আছে তথাকথিত ইতর (পশু) শ্রেণীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি। নীতিকথায় পশুর মানবায়ন হয়েছে, মানুষই যেন পশুর মুখোশ পরে গল্পে হাজির এবং সেই মুখোশ যথেষ্টই স্বচ্ছ, মানুষের স্ব-রূপটিকে বোঝার জন্য। তাই তাদের ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ নীতিগল্পে স্পষ্ট করেই দেখানো। যদিও এখানে জয় হয় বুদ্ধির। ন্যায়ের বা ধর্মের নয় রূপকথার মতো। সেই জন্যই নীতিগল্প প্রখর বাস্তববাদী, তার বিপদ ও উত্তরণ, সমস্যা ও সমাধান বাস্তব। নীতিগল্পের শিক্ষা বোঝা শক্ত নয়। গোষ্ঠী বা ব্যাক্তির স্বার্থরক্ষাই সমার্থক লক্ষ্য, আর তার উপায় হল বুদ্ধি। তাই হাস্যরসাত্মক গল্পগুলোতে বোকারাই নায়ক ও উপহাসের পাত্র। বাস্তব জগতের মতো নীতিগল্পও কঠিন ও নির্মম। আলোচ্য তিন গ্রন্থেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো সার্থকভাবে উপস্থিত।

ঈশপের গল্পের প্রমাণ পাওয়া যায় তার পরবর্তীকালে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখায় – "Aesop the fable writer", অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর কমেডি 'The wasps'— এ নায়ক ফিলোক্লেয়নকে 'absurdity'–র পাঠ দিয়েছিলেন ঈশপের রচনা থেকে। প্লেটো-র 'ফিডো'তে সক্রেটিস ঐ কারাগার বাসের সময় ঈশপের কিছু গল্প কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে ঈশপ রচিত নীতিবাক্য বলে প্রচারিত হলেও বেশ কিছু বাক্য তাঁর আদর্শের পরিপন্থী, একে অপরের বিপরীতধর্মী। তাই অনুমান করাই যায় অন্যান্য লেখকের সৃষ্টি পরবর্তীকালে সংকলনের সময় ঈশপের নামে গ্রন্থিত হয়।

ঈশপের গল্পের প্রথম দীর্ঘ অনুবাদ হয়েছিল ল্যাটিন আয়াম্বিক ত্রিপদীতে, ফেয়েদ্রাস কর্তৃক এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয় রাজা অগাস্টাসের সময়, ১ম শতাব্দীতে। এর কিছু অংশ কবি ঈনিয়াস দ্বারা, বাকি অংশ হোরেস দ্বারা অনূদিত হয়। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে অনুবাদ অপেক্ষা অভিযোজন কম হয়নি। নবম শতকে বিভিন্ন এশিয়া ও আমেরিকীয় ভাষায় অনূদিত হতে থাকে ঈশপের গল্প। সিরীয় ভাষায় করা 'Fables of Syntipas'; Uighur colllection মধ্য এশিয়ার এক ভাষায় করা। পর্তুগীজ মিশনারীদের আগমনের কারণে ষোড়শ শতকে জাপানে ল্যাটিন সংস্করণ থেকে রোমপ্রভাবিত জাপানি ভাষায় 'Esopo no Fabulas' (১৫৯৩) এবং পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ গ্রন্থ তিন খন্ডে 'Isopo Monogatari' রচিত হয় যেখানে ঈশপকে এমন আন্তরিক নিখুঁত উপস্থাপনা করা হয়েছে যাতে মনে হয় ঈশপ জাপান-জাত ছিলেন। সপ্তদশ শতকে মিশনারীদের হাত ধরে চীনা সংস্করণ (১৬২৫) প্রকাশিত

হয় এবং তারপর থেকে বিশ শতক অবধি যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় চীন দেশে। উনিশ শতকে 'The Oriental Fabulist' (১৮০৩) গ্রন্থে বাংলা হিন্দী ও উর্দু অনুবাদের সংকলন হয়েছে। অভিযোজিত সংস্করণ এরপর মারাঠী (১৮০৬), বাংলা (১৮১৬), হিন্দী (১৮৩৭), কন্নড় (১৮৪০), উর্দু (১৮৫০), তামিল (১৮৫৩) এবং সিন্ধি (১৮৫৪) ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার) বৌদ্ধ জাতক অবলম্বনে নিজস্ব লোককথার গ্রন্থ থাকলেও পালি ও বর্মী ভাষায় ঈশপের গল্প অনূদিত হয় ১৮৮০ সালে রেঙ্গুনের আমেরিকান মিশনারী প্রেস থেকে। নেপালের নেওয়ার ভাষায় জগৎসুন্দর মাল্লার অনুবাদ ১৯১৫-এ প্রকাশ পায়। আফগানি শিক্ষাবিদ হাফিজ সহর এর অনুবাদে ২৫০টি গল্প পার্শী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে 'লোকমান হাকিম' নামে।

মূল পাঠ ও শিশুপাঠ হিসেবে ঈশপের গল্পের অনুবাদের তালিকা সহজে সমাপ্ত করা যায় না। বিশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য ভাষায় কখনো গদ্যে, কখনো পদ্যে দেশে ও বিদেশে অনুবাদের এই ধারা অব্যাহত। পারস্পরিক আদান প্রদান, যাতায়াত, যোগাযোগ, যত বিস্তৃত হয়েছে অনূদিত ও রূপান্তরিত সংস্করণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে এই দেওয়া-নেওয়া ঈশপের জনপ্রিয়তার স্মারক।

পঞ্চতন্ত্রের জনপ্রিয়তা বহুশতবর্ষ ব্যাপী এবং দেশে ও বিদেশে বহুল ব্যাপ্ত। শতাব্দী ধরে বিদ্যালয়, পাঠশালায় পাঠ্য হিসাবে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে আজও শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ও অত্যন্ত সুপরিচিত। সার্বিক সামাজিক জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশে এবং পরিণত মনস্কতার উৎসেচক হিসেবে পঞ্চতন্ত্র এক অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থ। রাজ্যপাট চালনায় ও রাজনীতির সূক্ষ্ম ও চতুর নির্দেশনায় চাণক্য ও কমণ্ডকীয়র নীতির মতো পঞ্চতন্ত্রের নীতিও বিশেষ সহযোগী। বিশ্বের সমস্ত ধ্রূপদী সাহিত্যগুলোর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। হার্টেলের মতে ৫০টি পৃথক ভাষায় অন্তত ২০০টি অনূদিত পাঠ পাওয়া গেছে পঞ্চতন্ত্রের। প্রাচ্য থেকে সুদূর ফরাসী দেশে, পঞ্চম শতক থেকে বিংশ শতক অবধি এর অনুবাদ ও অনুসরণ হয়ে চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বাইবেলের পরে সম্ভবত পঞ্চতন্ত্রই একমাত্র গ্রন্থ যার বিপুল পরিমাণ অনুবাদ ও সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। জার্মান ভাষাবিদ Max Mueller তাই বলেছিলেন — "The history of the march of Indian tales from the east downwards the west is indeed wonderful, more wonderful and more instructive than many stories themselves," – [Das Panchatantra, J. Hertel, Berlin, 1914].

অনুবাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে বিদেশী ভাষায় অনূদিত পঞ্চতন্ত্র :-

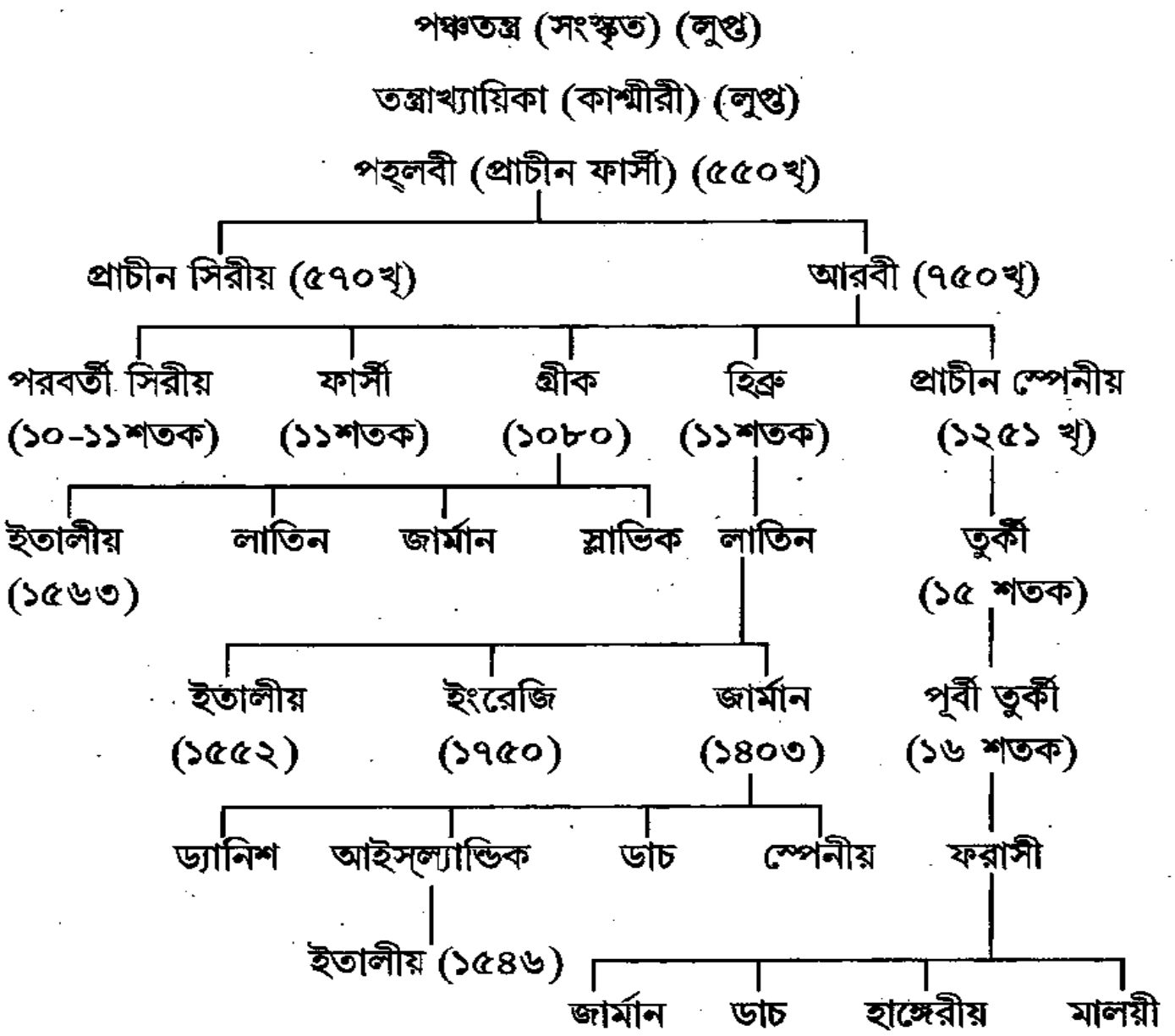

যদিও আমরা এই তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলোকে অনুবাদ বলেছি, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এগুলির প্রত্যেকটি যথাযথ অনুবাদ নয়। মূলের সঙ্গে এগুলির যথেষ্ট তফাত অনুমেয়। অনুবাদ, সংশোধিত সংস্করণ পুনর্কথন, ভাষান্তর, রূপান্তর, অনুকরণ, অনুসরণের মাধ্যমে পঞ্চতন্ত্রের মূল কাহিনি সর্বত্র সমানভাবে, সমান প্রকরণে, সমান ধারাবাহিকতায় রক্ষিত হয়নি। তার ওপর যখন কোনো দক্ষ গল্পকথক এর অনুসরণে লিখতে বসেছেন, তখন আবশ্যিকভাবেই তিনি হুবহু অনুকরণ না করে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি, কল্পনা, পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য অনুপ্রবেশ করিয়েছেন। দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী যেহেতু আপ্তবাক্য, নীতিবাক্যেরও প্রকারভেদ ঘটে তাই বিদেশীয় সংস্কৃতি ও সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত এই গ্রন্থের ক্রম-রূপান্তর ঘটেছে। যেমন ধরা যাক, পূর্ণভদ্র-কৃত সংস্করণের কথা। মূল গ্রন্থ থেকে এই সংস্করণ আকারে বৃহৎ কারণ এতে অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু গল্প মূলে ছিল না, অন্তত মূলানুগ অনুবাদে সেগুলি ছিল না। নীতি এবং রাজনীতি বিষয়ে

বিভিন্ন মতামত এখানে বিশদ করা হয়েছে। কিছু গীতিকবিতা ও শোককবিতা পূর্ণভদ্র সংযোজন করেছেন যা মূলে অনুপস্থিত। কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত মন্তব্য এতটাই জোরালো হয়ে গেছে যে মূল গ্রন্থে যে বিষয়ের উপলব্ধিতে কোনো সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে তা সংস্করণে অন্য অর্থে উপনীত হয়েছে। যেমন, মূলের এক অসহায় বলদের নিরুপায় মৃত্যুকালিন জবান অনুবাদে তার অপরিতৃপ্ত কাম যন্ত্রনার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। অথচ পঞ্চতন্ত্রে ব্যবহৃত যে কোনো প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও সমানুভূতির জায়গাগুলি এর এক অনন্য সম্পদ। বহির্ভারতে এই রূপান্তর ও পরিবর্তন আরো প্রকট কেননা সংস্কৃতিগত কারণে গ্রহণ-বর্জন-পরিমার্জন-এর পার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই এই সৃষ্টিগুলো যতটা 'faithful translations', তার চেয়ে অনেক বেশি 'adaptations'।

পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত 'হিতোপদেশ'-এ বরং মূলের সঙ্গে অনেক বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়, একথা আগেও বলেছি। ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদেশীদের সহজে বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রাচীন গদ্যগ্রন্থ অনুবাদ করা শুরু হয়। উইলিয়ম কেরীর উৎসাহে গোলোকনাথ শর্মা ১৮০২ সালে হিতোপদেশ-এর বঙ্গানুবাদ করেন, শ্রীরামপুর মিশন থেকে যা প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থের চারটি উপদেশই — মিত্রলাভ, মিত্রভেদ, সন্ধি ও বিগ্রহ সংক্ষেপে অনুবাদ করেন। রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ১৮০৮ সালে হিতোপদেশ অনুবাদ করেন, কিন্তু সেই গ্রন্থ পাওয়া যায়নি ও সেই বিষয়ে কিছু জানাও যায়নি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০৮ সালে সংস্কৃত হিতোপদেশের সরল অথচ গম্ভীর বঙ্গানুবাদ করেন। সরল পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা এবং স্থানীয় উপভাষার ব্যবহারে মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন যথার্থ ভাষাশিল্পী। রচনাশৈলীতে বাস্তব চিত্র রঙ্গ-পরিহাস এবং সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি সবই যুগোপযোগী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৮২৩ সালে পাথুরিয়াঘাটার রাজা সুখময় রায়ের বংশধর শিবচন্দ্র রায় ও নৃসিংহচন্দ্র রায়ের নির্দেশে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি —পরিচ্ছেদ ভাগে সর্বপ্রথম একইসঙ্গে হিতোপদেশের মূল সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। পুস্তক পরিচিতিতে উল্লেখিত হয়েছিল "পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃকসঙ্গৃহীতসংস্কৃতগ্রন্থ তদীয়ার্থ গৌড়ীয়ভাষায় শ্রী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্গৃহীত হইয়া কলিকাতায় সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।। শকাব্দাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০"। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত মাঘ ১৪১৯ / জানুয়ারি ২০১৩ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা-সংগ্রহে অনুবাদ সহ এই হিতোপদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ১৮৩০ সালে কলকাতা থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার-এর হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদ সংস্কৃত মূল গ্রন্থসমেত প্রকাশিত হয় একাধিকবার। এই সময়েই C. Wilkins অনূদিত বাংলা ও ইংরেজি

হিতোপদেশ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১৮৬০ সালে এক সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এঁদের অনুবাদ বিষয়ে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না।

কুলদারঞ্জন রায় মসুয়ার রায় পরিবারের অন্যতম পরিচিত এক ব্যক্তিত্ব যিনি দেশী-বিদেশী ধ্রুপদী সাহিত্য ছোটদের জন্য তাদের মতো করে লিখেছিলেন অনুবাদের মাধ্যমে। সেই প্রচেষ্টাতেই ১৯২২-এ রচনা করেন ছোটদের পঞ্চতন্ত্র। পারিবারিক ধারা অনুযায়ী চমকপ্রদ ও আকর্ষক অনুবাদে এই পাঠ শিশুদের মধ্যে জনপ্রিয়। স্বাভাবিকভাবেই মূলের থেকে শিশুপাঠ্যের উপযোগী করার লক্ষ্যে কিছু পার্থক্য এসেছে এবং সংক্ষিপ্তকরণ হয়েছে। এই পরিবারেরই পরবর্তী প্রজন্ম উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম সন্তান সুখলতা অনুবাদ করেন হিতোপদেশ ও ঈশপের গল্প ২০ শতকের প্রথমার্ধে। প্রথম থেকেই দেশী বিদেশী রূপকথা-নীতিকথার অনুবাদ (শিশুদের জন্য) তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর ভাষা সহজ, প্রাণবন্ত, উপভোগ্য। সঙ্গে তাঁর নিজের আঁকা ছবিতে লেখার মাত্রা হয়েছে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয়। শিশুদের জন্য শুধু লেখা নয়, শিশুশিক্ষার ভাবনাও তাঁর অনুবাদে স্পষ্ট যা মূলত এই পাঠগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁর অনুবাদ নির্মল আনন্দের পাশাপাশি শিক্ষার উপযোগী ও কাজের-ও হয়েছে।

রাজশেখর বসু ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে একটি সচিত্র হাতে লেখা বই প্রকাশ করেন যা আসলে হিতোপদেশের বারোটি গল্পের অনুবাদ। সাড়ে আট ইঞ্চি লম্বা, সাড়ে ছয় ইঞ্চি চওড়া তিরিশ পাতার খাতাতে বাদামী রঙের বোর্ড কভার, বেগুনি রঙের মোটা কাগজের মলাট, আরো নানা কারিগরীর মাঝে আঁকা এক তোতাপাখি, নীচে লেখা 'হিতোপদেশের গল্প'। সুদৃশ্য এই পাণ্ডুলিপির নির্মাণে সময় লেগেছে পাঁচ বছর। বিষ্ণুশর্মা রচিত হিতোপদেশের গল্পের বারোটি গল্প নেওয়া হয়েছে, রচনা চব্বিশ পাতায় সমাপ্ত। তাঁর একমাত্র ছোটদের জন্য লেখা এই বইয়ের গদ্য ঋজু, সরল। বাহুল্য যেমন নেই, তেমন শিশুসুলভ করার অকারণ ন্যাকামিও নেই। যে কোনও প্রকৃত শিশু সাহিত্যিকের মতোই রাজশেখর শিশুদের আধা-মানুষ ভাবেননি। নিজের দৌহিত্রীপুত্রকে মাতৃভাষার শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত এই গ্রন্থ সযত্নে গড়া। গল্পের ভূমিকা করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। রাজার পুত্রদের দোষমুক্ত করে বিদ্বান ও গুণবান করার প্রয়োজনেই যে গ্রন্থের বিকাশ তা স্পষ্ট এবং তা আপামর বাঙালি শিশুর ভবিষ্যৎ নির্মাণের সেরা হাতিয়ার। গুরুর উচ্চারিত শব্দ শিখে তোতাপাখি যেভাবে চৌকস হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা যেন প্রতীক। মনন, মেধা, শিল্পবোধ, রুচিবোধ আর বাণী — সব মিলিয়ে এক সময়োপযোগী রূপান্তর করেন রাজশেখর বসু যা রঙের বৈচিত্র্যের, ভাষা, লিপি, মাত্রা, বিন্যাসের অনুপম শিল্পকর্ম — composite art form।

ঈশপের গল্পের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন হরিশচন্দ্র পালিত ১৮৬১ খৃঃ। তাঁর পরে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ সালে। বাংলা গদ্যের জনক না হলেও তিনি যে পথপ্রদর্শক তা তাঁর মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থগুলির ভাষা দেখলেই বোঝা যায়। তাঁর অনেক অনুবাদের মতো ঈশপের গল্প অবলম্বনে 'কথামালা' (১৮৫৬) স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর। অনুবাদ হয়েও তা মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। ক্লাসিক সাহিত্য হয়ে উঠেছে। অনুবাদ গ্রন্থগুলি স্বাভাবিক, সরস ও মূলানুগ হয়েছে। গদ্যানুবাদে তাঁর মতো কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে অতি অল্প অনুবাদকই দেখাতে পেরেছেন। বাংলা গদ্যের দ্রুত উন্নতির জন্য অনুবাদ যে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তা তিনি করে দেখিয়েছেন। নিছক সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে লোকহিত সাধনে সাহিত্যের ব্যবহার তাঁর কাছে বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল যা আমরা আলোচ্য মূল গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রেও দেখি। সদুপদেশ দেওয়ার অভিপ্রায়ে ৬৮টি গল্পের অনুবাদ করেছিলেন রেভেরণ্ড টমস জেমস-এর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনেও। পরে ৩৭তম সংস্করণে আরো ৬টি গল্প সংযোজন করলে গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪টি। মূলানুগ ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, পঞ্চতন্ত্রের আরো তিনটি অনুবাদ গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া গেলেও গ্রন্থের বিশদ বিবরণ প্রতুল নয়। এগুলি হল—রামগোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি যা ১২৮৭ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যশোদাকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পঞ্চতন্ত্র ও জ্ঞানামৃত কথা' ১৯২৫ এবং বিজিতকুমার ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত 'পঞ্চতন্ত্র', এটি ১৯৯৫ সালে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী থেকে মুক্তি পায়। এই অনুবাদ কর্মগুলোর যাথার্থ বিচার করা সম্ভব হয়নি প্রকাশিত গ্রন্থের অপ্রাপ্তির কারণে। এমনই হয়তো আরো অনূদিত ও সংকলিত গ্রন্থ ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে সগৌরবে।

'ধর্ম' এবং 'নীতি' দুটো খুব কাছাকাছি শব্দ হলেও দুইয়ের মধ্যে উপলব্ধির বৈচিত্র্য অবশ্যই আছে। ধর্ম যদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ধারণা হয়, নীতি — সমাজে-মননে প্রতিষ্ঠিত কিছু অবশ্যপালনীয় শর্ত। সব দেশের বিভিন্ন পরিকাঠামোয় এই দুইয়ের চর্চা নিজস্ব ধরনে হয়েই থাকে। প্রেক্ষাপট, সমাজবিন্যাস অনুযায়ী এদের প্রকারভেদও অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবু কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিশ্বজনীন হয়ে যায় বলেই তা অমর, শাশ্বত, চিরকালীন। ঠিক যেমন আমরা পাই আমাদের আলোচ্য তিন সারগ্রন্থ ও তার অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে। খৃষ্টপূর্ব যুগের সৃষ্টি শতাব্দী ব্যাপী বহন করে চলেছে ধ্রুপদীয়ানার ঐতিহ্য। একদা কথ্য সাহিত্য সময়ের বিস্তৃত পরীক্ষায় হয়েছে ক্লাসিক। মানুষের কর্তব্য-সচেতনতা-নীতিবোধজাগরণে এদের ভূমিকা ও অবদান কোনোদিনই স্তিমিত হবে না। "Living wisely and well in

the truest sense" —আমাদের সর্বজনীন প্রত্যাশা, আর সেই প্রত্যাশার পূরণে ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ যথার্থ সার্থক। ❑

ঋণ স্বীকার :

১) The Pancatantra, Visnu Sarma, trans by Chandra Rajan, Penguin Books, 1993, New Delhi.

২) পঞ্চতন্ত্রের গল্প, সম্পাদনা – প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, NCERT, New Delhi, ebook version: www. BanglaBook.org.

৩) Encyclopaedia of Indian liferature, 1-5 volumes, Sahitya Academy, lditel by – Sisir Kumar Das.

৪) সংস্কৃত সাহিত্যর রূপরেখা, ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪

৫) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০০

৬) Concise companion to English Literature, Oxford University Press, - ed. Dinah Birch & katy Hooper, 2012.

৭) Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, Penguin Books, ed. J.A. Cuddon & C.E. Preston, 1999.

৮) আখ্যানতত্ত্ব, অমিতাভ দাস, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০১০

৯) A History of Sanskrit Literature, A. Barriedale Keith, Oxford at the Clarendon Press, 1928.